জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং—২৪, ৫ম বর্ষ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং বুধবার

JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No-24, 5th year, 1996, Wednesday.

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে অক্টোবর, ১৯৯৫ ইংরেজী। এরপর মূলতঃ সরকারের অসদিচ্ছা ও দেশের চরম রাজনৈতিক সংকটের অজুহাতে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সংলাপ স্থগিত হয়ে যায়। তা সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও শান্তি প্রক্রিয়া বজায় রাখার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি অদ্যাবধি যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রেখেছে।

এটা সকলের কাম্য যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটিয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটা স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার এসে যেন দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। যেহেতু যতদিন পর্যন্ত দেশে এই রাজনৈতিক সংকট ও বিশৃংখলা অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও ব্যাহত হবে। আর এই রাজনৈতিক সংকটের অন্তরালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ন্যায় দেশের আরো অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ধামাচাপা পড়ে যেতে বাধ্য। এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটলে যে আবার সংলাপ প্রক্রিয়া চালু করা যায়—এটা জনসংহতি সমিতিরও কাম্য।

দীর্ঘদিনের বিরাজিত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুস্থ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জনসংহতি সমিতির সাথে বি এন পি সরকারের সংলাপ শুরু হয় তিন বছর আগে। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এসেছে। এক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি পার্বত্য সমস্যার সমাধানের জন্য কোন রকম অসহনশীলতা দেখায়নি। পরন্তু জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে সরকারের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গিকে দূরীভূত করতে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়—বার বার ১৩টি বৈঠকের পরও এই সংলাপের ফলাফল এখনো শূন্য বলা চলে। যেহেতু জুম্ম জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার এখনও পর্যন্ত অপারগতা ও অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করছে। বিশেষ করে বিরোধীদলগুলোর সাথে সরকারের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের দায়িত্বশীলতা হারিয়ে অবশেষে বিরোধীদলগুলোর আন্দোলনের মুখে এই রাজনৈতিক সংকটের দোহাই দিয়ে সংলাপের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এরূপ দায়িত্বহীনতার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের সাথে সংলাপ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়।

এতদসত্বেও জনসংহতি সমিতি অদূর ভবিষ্যতে দেশের পরবর্তী বৈধ সরকারের সাথে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সংলাপ চালিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্বের সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যথায় জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

● শ্রীসত্যজিৎ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট বর্তমানে এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধীদলগুলোর পরস্পর আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধংদেহী অবস্থানের ফলে দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং ব্যাহত হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। আর এই ক্ষয়ক্ষতির প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হচ্ছে দেশের আপামর কৃষক-শ্রমিক-মজুর তথা সর্বনিম্নশ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষ।

মূলতঃ দেশের এই রাজনৈতিক সংকট হচ্ছে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সংঘাত। এই সংঘাতের মাধ্যমে সরকার ও সরকারী দল চাচ্ছে গণতন্ত্রের নামে দেশের সর্বময় ক্ষমতা বজায় রাখতে ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই ক্ষমতাকে আরো পাকাপোক্ত করতে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর লক্ষ্য হলো—বি-এন-পি সরকারের পতন ঘটিয়ে অদূর ভবিষ্যতে দেশের শাসনযন্ত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাই উভয়পক্ষ আজ এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে নিজেদের সর্বশক্তি ও কলাকৌশল নিয়ে একে অপরের বিপরীতে যুযুধমান। এই অবস্থায় বিএনপি সরকার আজ দেশের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্র ও আইন শৃংখলা রক্ষার নামে দাঙ্গা-পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী নিয়ে বিরোধী দলগুলোর সবল কার্যক্রম স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলো সরকারী সকল কার্যক্রম জব্দ করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান, অর্থ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ অফিস-আদালত বর্জন ও বয়কট করার জন্য ঘন ঘন হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এই রাজনৈতিক সংকটের কারণে দেশের আপামর জনগণের স্বার্থ আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। জাতীয় স্বার্থ এখন গৌণ। পক্ষান্তরে দলীয় স্বার্থ ই আজ জাতীয় স্বার্থের অনেক উপরে স্থান করে নিয়েছে। ফলে দেশের জনগণের দুর্দশার আর সীমা নেই। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অবক্ষয়ের সাথে সাথে তাদের দারিদ্র্যতা ও দৈননন্দি সংকট এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, দেশের বর্তমান এই রাজনৈতিক সংকট ও সংঘর্ষ এক সাময়িক সংকট মাত্র। যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা নিয়ে এই সংকটের সৃষ্টি। সরকার চাচ্ছে সংবিধান ও শাসনতন্ত্রের বদৌলতে নিজের কর্তৃত্বাধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা বজায় রাখতে। আর বিরোধী দলগুলো চাচ্ছে নিরপেক্ষ এক তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। মূলতঃ উভয়পক্ষই নিজেদের অনুকূলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যুদ্ধে মেতে উঠেছে। অথচ সরকার পক্ষ সামান্য নমনীয়তা প্রদর্শন করলে এই সংকটের সমাধান সহসাই হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য বিএনপি সরকারের দায়িত্বশীলতা বেশী থেকে যায়। যেহেতু দেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বজায় রাখা ক্ষমতাসীন সরকারের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বিএনপি সরকার তার দলীয়করণ নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারিতার কারণে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সংসদীয় উপ-নির্বাচনে চরম কারচুপি ও পক্ষপাতিত্বের ফলে বিএনপি সরকার জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক আস্থা হারিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবেই বিরোধী দলগুলোর নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছে। এক্ষেত্রে বিএনপি সরকার সত্যিকার গণতান্ত্রিক হলে নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে তার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তা না হয়ে বিরোধীদলের দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে সরকারের স্বৈরাচারী ও একতরফা নির্বাচনের ফলে এই সংকট উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর

হয়ে চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আর ফলস্বরুপ এই সংকটের অন্তরালে অনেক জাতীয় সমস্যাসহ অনেক অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অনুরূপ ভাবে সুদীর্ঘ বছরের পুরনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের প্রক্রিয়াও আজ এই সংকটের অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে এই রাজনৈতিক সংকট কি সত্যিই অন্তরায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে পার্বত্য চটগ্রাম সমস্যার প্রতি বি এন পি সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পূর্বেকার সরকারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। যেমনভাবে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট দেশের পূর্বেকার রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরঞ্চ বলা যায় দেশের আজকের এই সংকট সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলোর পূর্বেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতির এক চরম বহিঃপ্রকাশ। অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এর সমাধানের ক্ষেত্রে পূর্বেকার সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছিন্ন ধারায় বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অমীমাংসিত রাজনৈতিক সমস্যা-গুলোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটি সবচেয়ে জটিল ও পুরনো সমস্যা। বিগত ৮০'র দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সরকার কর্তৃক এই সমস্যাটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পরিচিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়ে আসছে। আজ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলও এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন। ইতিপূর্বে অবশ্য এই সমস্যাকে বিভিন্ন সরকার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করেছে। ১৯৭৫ সালের আগে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই সমস্যাকে নিছক অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জুম্ম জাতিসমূহের আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে ধরে নিয়েছিল। ফলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জুম্ম জাতিকে বাঙ্গালী জাতিতে উন্নীতকরণ করে এই সমস্যাটির সমাধানের ব্রতী হয়েছিল। তাই তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ও মহান জুম্ম নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর বদলে সকলকে বাঙ্গালী হয়ে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৭৫ সালের আগষ্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে প্রধানত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ও তাদের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের ভূমি বেদখল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা অরাজনৈতিক সমাধানের অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ দেশের শাসন ক্ষমতায় এসে একদিকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুসলমানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ও ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে আর অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। তাঁর আমলে ১৯৮৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ৬টি বৈঠক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার রাজনৈতিক সমস্যার নামে ষড়যন্ত্রমূলক পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রদান করে এই সমস্যার সমাধানের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে এই সমস্যার জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিস্থিতির অবনতি ও সামরিক সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অতঃপর ১৯৯০ সালের বাংলাদেশের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-শ্রমিক-কৃষক তথা আপামর জনগণের দুর্বার গণআন্দোলনে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। পরিশেষে ১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নূতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯২ সালের

নভেম্বর হতে শুরু হয় সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সংলাপ।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সুদীর্ঘ তিনবছর ধরে জনসংহতি সমিতির সাথে পর পর ১৩ বার সংলাপ চালিয়েও এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে বাংলাদেশ সরকার সদিচ্ছার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সংলাপের নামে বাংলাদেশ সরকারের কালক্ষেপণের কৌশলই এই ব্যর্থতার মূল কারণ। তাছাড়া এই সংলাপের সময় সরকারী প্রতিনিধিরা বিরোধী দলীয় সাংসদদের সংসদ বর্জনসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংকটের দোহাই দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের মূল বিষয়কে পাশ কাটিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। সেই সময়ে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সংলাপের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো এবং জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন জোরদার করা।

এটা আজ কারো অজানা নয় যে, বি এন পি সরকারের চরম দুর্নীতি, দলীয়করণ নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবীতে বিরোধীদলীয় সাংসদরা প্রথমে সংসদ অধিবেশন বর্জন ও পরে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু এই সময় বি এন পি সরকার বিরোধীদলীয় সাংসদদের সকল প্রতিবাদ, সংসদ অধিবেশন বর্জন ও সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগকে কোন তোয়াক্কা না করে দলীয় স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রম, সংসদ অধিবেশন, বিভিন্ন সংশোধনী বিল উত্থাপন, নূতন বিল গ্রহণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। বরাবরই বি এন পি সরকার বিরোধীদলীয় সাংসদদের সংসদ বর্জনের সুযোগে তার দলীয়করণ কর্মসূচী ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সদা তৎপর ছিল। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়েও বি এন পি সরকার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হয়নি। সর্বোপরি সকল বিরোধীদলের যৌথ দাবী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদীয় নির্বাচনের দাবীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বি এন পি সরকার একদলীয় সংসদীয় নির্বাচন করার চরম স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু এটা অত্যন্ত উপহাস্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারী কমিটি বার বার বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক তৎপরতাকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে সংলাপে উত্থাপন করেছিলেন।

এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল সরকারের নিতান্ত এক অমূলক অজুহাত মাত্র। যেহেতু সংসদের অধিবেশনে বিল উত্থাপন ও বিল পাশ করে সরকার সংসদীয় আইনের মাধ্যমে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যেমন করেছে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি। মূলতঃ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার জনসংহতি সমিতির পাঁচদফা দাবীকে বরাবরই উপেক্ষা করে চলেছে। তাছাড়া প্রথম হতে বিরোধীদলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে বি এন পি সরকার তাঁর স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলে এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও দলের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাসহ অনেক জাতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়ে সরকারের দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য লাভ করে। অথচ বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের অন্তরায় হিসেবে দেশের রাজনৈতিক সংকটকে নির্লজ্জভাবে অজুহাত দেখিয়েছে।

অপরপক্ষে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরেও প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর ও সমাধানের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশ সরকারের এই হীন কার্যক্রম কিন্তু যুদ্ধবিরতির শুরু থেকে অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বার বার যুদ্ধবিরতি লংঘন করে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামরিক টহলদান ও এ্যাম্বুশ করা,

শান্তিবাহিনীর গোপন আস্তানায় হামলা, নিরীহ জুম্মদের উপর হয়রানি, লুঠপাট, গ্রেপ্তার, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হীন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার সামরিক সন্ত্রাস সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। উভয়পক্ষের যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে যেতে পারে এই অজুহাতে সেনারা অঘোষিত যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এই উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাম্প স্থাপন, নূতন সেন্ট্রি-পোষ্ট নির্মাণ ও সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর এইরূপ যুদ্ধবিরতি লংঘনের ফলে শান্তিবাহিনী বিগত দু'মাসে বেশ কয়েকবার সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সেনাবাহিনীর এসব সামরিক কার্যকলাপ ছাড়াও জেলার বেসামরিক প্রশাসনও সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জুম্ম ছাত্র-জনতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সদা তৎপর রয়েছে। এক্ষেত্রে জেলার পুলিশ প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধর্ষণের প্রতিবাদ ও ন্যায্য গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আয়োজিত সভা ও মিছিলে দাঙ্গা-পুলিশী হামলা, ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বিভিন্ন মামলা দায়ের করা, গ্রেপ্তার করা, দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের লেলিয়ে দেয়া প্রভৃতি হীন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া জুম্ম জনগণকে নিজের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। এই লক্ষ্যে জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় নূতন ক্যাম্প স্থাপন করে অনুপ্রবেশকারীদের পুনর্বাসন ও গোপনে জমির বন্দোবস্তি দেয়া হচ্ছে। সরকারী প্রশাসনের এইরূপ কার্যক্রমের ফলে অনুপ্রবেশকারী ও জুম্মদের মধ্যে ভূমি নিয়ে বিরোধ দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এর ফলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া জমিও ফেরৎ পাচ্ছে না। এভাবে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার আজ ভূমি অধিকার হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে।

জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও বাংলাদেশ সরকার সদিচ্ছার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে ১৯৯৪ সালে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হলেও কেবলমাত্র দুই পর্যায়ে ৫,১৮৬ জন শরণার্থীকে ফেরৎ আনতে সরকার সক্ষম হয়েছে। এইসব প্রত্যাগত শরণার্থীদেরকে প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব বাস্তবায়িত না করায় অন্যান্য শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে সরকার জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাপারে কিছু নূতন গুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষণা করলেও এসব প্রস্তাবে নূতনত্ব কিছুই নেই। পূর্বের বিবেচনাধীন প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। সরকারের এইরূপ প্রহসনমূলক মনোভাবের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত এই শরণার্থী সমস্যার সমাধানও আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের চাপিয়ে দেয়া পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে সরকার এই সমস্যার সমাধানের পক্ষপাতি। এই উদ্দেশ্যে বি এন পি সরকার সংলাপের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম আজও চালিয়ে যাচ্ছে এবং স্বায়ত্বশাসন প্রদানের নামে এই গণধিকৃত পার্বত্য জেলা পরিষদকে উপস্থাপন করে সরকার দেশে-বিদেশে আজও জনমত বিভ্রান্ত করছে।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, দেশে একটা পূর্ণ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান সুদূর পরাহত। বর্তমান বি এন পি সরকারের মত উগ্র ধর্মান্ধ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদী যে কোন সরকার হতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জুম্ম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশেষে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সংলাপের প্রক্রিয়া বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ হলে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ছাড়া জুম্ম জনগণের অন্য কোন গত্যন্তর থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য—জুম্ম জনগণের গণজাগরণ যখন গণবিস্ফোরের রূপ লাভ করবে তখনই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সুনিশ্চিত হতে পারে।

—:—

"পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান"

—জনসংহতি সমিতি

"পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতি অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল হইবে।"

—এম. এন. লারমা
জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ

অভিমত

Chittagong Hill Tracts

Gross violations of human rights in the south-eastern part of Bangladesh

The Chittagong Hill Tracts (CHT) covering an area of 5, 093 sq. miles in south eastern Bangladesh bordering the Arakan and Chin States of Myanmar and Tripura and Mizoram States of India is the homeland of ten multilingual indigenous groups, currently numbering about one million people. They are collectively known as Jummn Nation the First Peoples of the CHT. They are Chakma, Marma, Tripura, Mro, Lushai, Khumi, khyang, Chak, Bawm and Pankhu.

The Jumma People are distinct aud different from the majority Bengali population of Bangladesh in respect to race language, culture religion and ethnicity. Their main occupation is subsistence farming known as Jhum (shifting cultivation) in contrast to the wet rice cultivation system in the plains of Bangladesh.

Similar to other indigenous peoples of the world, the Jumma People were also independent until the British colonisation of the CHT in 1860. Through out the colonial rule, they had enjoyed special status which permitted them self government and the non indigeonus peoples were prohibited from setting and owning land in the CHT in 1947, after partition of India, the CHT became a part of Pakistan, During the Pakistan rule, the Chittagong Hill Tracts 1900 Act was amended and special status of the CHT was abolished and influx of non indigenous peoples in the CHT started.

The predicament of the Jumma People began with the building of a hydro dam in the early sixties which flooded 1,036 sq. km of land sub-merged 40% of their best agricultural lands and displaced about 100,000 Jummas from their ancestral domain. less than 5% of the promised compensasion money was paid to the Jummas. Even now less than 10% of the Jummas have access to electricity.

After independence of Bangladesh in 1971 the goverment refused to make any provision in the constitution for the protection of the Indigenous Jumma Peoples of Chittagong Hill Tracts rather the successive govemments in power have been carrying out policy of ethnic cleansing and eithnocide.

There has been a systematic violation of human rights against the Jumma people from the very inception of Bangladesh. Many innocent Jumma people, mostly women and children were ravaged several hundreds of houses were burnt to ashes hunddreds of women were raped, properties were looted. The massive violation of human rights include unlawful killings extra Judical execution, torture arbitrary arrest indiscriminate, beatings imprisonment withouttrial, rape & gang rape, forrcible evction, religious conversion, seizure of cultivable lands and habitations, socio religious and cultural persecution including restrictions on movement, speech, dress, etc. From 1980 to 1993 more than eleven major massacres took place and numerous reports of atrocities documented, jointly perpetrated by the Bengali settlers and Bangladesh security Forces against the Jumma people. As a result more

than 56, 000 Jumma People were forced to migrate to Tripura, a province of India.

The conflict over land together with the threat to their existence, the Jumma Peoples were forced to resort to arms in defence of their ancestral homes and identity. From 1975 on wards, their main political party 'The Jana Samrati Samiti' (United Peoples Party) and its armed wing the Shanti Bahini (Peace force) had been fighting a guerrilla war against the army and groups of armed settlers.

The JSS announced unilateral cease fire on first of August 1992 with a positive view to initiate a peace process towards political solution of the crisis. As a result the government agreed to a cease fire in the later part of 1992. This happened due to intense lobbying by the Jummas and mounting pressure on the Bangladesh government from the internatianal community. To date eleven rounds of peace talk have taken place between the Bangladesh government Committee and the JSS representatives in which the JSS, came up with some concrete proposals. Despite all these, the peace talks have made little progress because of lack of sincerity on the part of the Bangladesh government it seems that the government entered into this peace process to please only the foreign donor countries and aid agencies. The present peace endeavour, unless supported by the international community, is unlikely to lead to an early resolution of disputes. There has been numerous complaints of cease fire violations committed by Bangladesh Army.

Bangladesh made a deal with india in 1992 for the repatriation of the Jumma refugees from Tripura camps prior to political solution of CHT crisis. So far, two batches, consisting of more then 900 families were repatriated to CHT. Upon their return they found that their lands and villages were under occupation by Bengali settlers and the 16 point package deal offer made by Bangladesh government was not implemented. This also clearly indicates Government's laek of credibility and sincerity for peaceful resolution of the crisis.

Bangladesh government has kept up its operations at a tremendous costs of its economic and social health. To maintain a large security force in the CHT, the government annually spends about 525 millions. Oboviously, this is a very heavy burden for a country struggling to fight poverty. It has enabled the army to exert overwhelming influence often with a crippling effect on the political and social life of the country. The violence and the rapid militarization has deeply effected the conduct the conduct and thinking of the average persons.

Due to unfavourable geographical location of the CHT, the Jumma Nation remained backward and isolated from the rest of the world. But the Jumma peoples continue to campaign by regularly attending many international meetings and conferences through which they have been able to expose the human rights abuses and put demand to the international community. As a result many countries and organisations are extending their support and showing sympathy to the Jumma People. Now in many countries of the world, there are many groups formed in support of the righteous demand of the Jumma people. A historical initiative has also been undertaken to convene an International Conference on CHT in September 1995 in Bangkok, Thailand by Asia Indigenous Peoples Pact 'AIPP', Asia Cultural Forum and Development (ACFOD), Japan Committee on CHT Issue, Organising Committee Chittagong Hill Tracts Campaign, South Asia Human Rights

Documentation Centre supported by the Asia Pacific NGOs networks and many international organisations.

The conference is to assess and develop ways and means for peaceful resolution of the CHT crisis.

● **Subodh Bikash Chakma**

সৌজন্য : CERAS NEWSLETTER

Vol . 1, No. 4, 1995

[সম্প্রতি খাগড়াছড়ির পাঁচজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি মুখোস বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নিকট এক মর্মস্পর্শী আবেদন পেশ করেন। আবেদন পত্রটি জনসাধারণের নিকটও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এই আবেদন পত্রে একদিকে যেমন মুখোশ-বাহিনীর সন্ত্রাসী তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে এই মুখোসধারী সন্ত্রাসী ও চক্রান্তকারীদের পরিচয় ও তাদের হীন ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নে আবেদন পত্রটি হুবহু ছাপানো হল।]

সমীপে
মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা,
খাগড়াছড়ি।

বিষয় : খাগড়াছড়িতে শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আবেদন।

আবেদনকারীগণ-জনসাধারণের পক্ষে নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, খাগড়াছড়ি এলাকার সচেতন নাগরিক হিসাবে দলমত সম্প্রদায় নির্বিশেষে আপামর শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা এ এলাকার তথা সমগ্র জেলার শান্তি শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তার খাতিরে নিম্ন-লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট কোন সংগঠন বা মতাদর্শের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। আমাদের বক্তব্য অন্যায়ের

বিরুদ্ধে, বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আমরা সম্পূর্ণ দল নিরপেক্ষভাবে স্রেফ জনস্বার্থে এবং এলাকার শতকরা ৯৯ জন লোকের মতামতের প্রতিফলন হিসাবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে, এই বক্তব্য পেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

১। ক) নিজস্ব বিশেষ কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য লইয়া (ধ্বংসাত্মক বা রাষ্ট্র বিরোধী না হইলে) কোন দল বা কমিটি গঠিত হওয়া স্বাভাবিক। তাহাতে কাহারও কিছু বলার থাকে না। বাংলাদেশে সর্বত্রই আমরা তেমনি কত দল বা কমিটির অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

খ) কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গত ২৬-০৯-৯৫ ইং তারিখে খাগড়াছড়িতে আমরা একটি অদ্ভুত কমিটি/দল (নামে কমিটি হইলেও তাহাদের ছাপানো প্যাডে ইহাকে একটি দল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে) রাতারাতি আবির্ভূত হইতে দেখিলাম যাহার জন্ম বা প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক নিয়মে হয় নাই। এই আবির্ভাব এক কথায় অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। এ যেন এক ভানুমতির খেলা। পর্দার অন্তরালের কাহিনীসহ এই দলের জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং এই অস্বাভাবিক নবজাতকের প্রচণ্ড লম্ফ-ঝম্প ও দাপট দেখিয়া এলাকার জনসাধারণ হতভম্ব নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন, শংকিত।

২। ক) বিভিন্ন এলাকার যে সকল যুবককে জড়ো করিয়া উক্ত দল গঠন করা হইয়াছে জনসাধারানের কাছে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় কি? এক কথায়—মার্কামারা বখাটে উশৃঙ্খল যুবক, বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত আসামী। ইহাদের অনেকের বিরুদ্ধেই থানায় ফৌজদারী মামলা ঝুলিতেছে। অবশ্য সম্প্রতি অতি সহজ উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন ও রাজকীয় জীবনযাত্রার প্রলোভনে অন্য কিছু সংখ্যক বেকার যুবকও সেখানে জুটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

খ) এই দলের সভাপতি অলক চাকমা এই দল গঠিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও ফৌজদারী মামলার পলাতক আসামী ছিলেন। এই অলক চাকমা এক চমকপদ ভেলকিবাজির বদৌলতে রাতারাতি এক পরাক্রমশালী নেতায় পরিণত হওয়ার কারণে খোদ জেলা প্রশাসক মহোদয়ও এই পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তারের পরিবর্তে সরকারীভাবে চিঠি লিখিয়া তাহার সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসার আহ্বান জানাইয়া ছিলেন (জেলা প্রশাসকের স্মারক নং ১১/-৬২২/ গোপনীয়, তারিখ ৪-১০ ৯৫ ইং দ্রষ্টব্য)। হায় আইন! তুমি আজ কোথায়? দাখিলকৃত কোন স্মারকলিপির প্রত্যুত্তরে জেলা প্রশাসক কর্তৃক কোন নেতাকে আলোচনায় আহ্বান জানানো এই প্রথম দেখা গেল।

৩। ক) উক্ত দলের নাম দেওয়া হইয়াছে "পিসিপি পিজিপি'র সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি"। নামেই বুঝা যায় সন্ত্রাস দমন বা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বা সেই ক্ষমতা তাহাদের আছে। অথচ আমরা জানি সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব সরকারই পালন করিয়া থাকেন। সরকার প্রশাসন যন্ত্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও অন্য কোন দল কমিটি কর্তৃক সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করা বা সেই উদ্দেশ্যে মাঠে নামিয়া পড়ার নিগূঢ় অর্থ আমাদের নিকট বোধগম্য নহে।

খ) পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণপরিষদ নামক সংগঠন সমূহ কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাইলে তাহা দমনের বা প্রতিরোধ করার যথোপযুক্ত ক্ষমতা সরকারের অবশ্যই আছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে কোন কার্পণ্য থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন মনে করিলে বা আইনসঙ্গতভাবে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে সরকার উক্ত দুইটি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ তাহাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন। ইহাতে কাহারো কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু সরকারের এই প্রশ্নাতীত ক্ষমতার উপর অনাস্থা প্রকাশ পূর্বক কোন দল কর্তৃক সন্ত্রাস প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করার অর্থ কি? ইহা বিসের ইঙ্গিতবাহী? সরকারের উপর আর একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কি?

গ) যাহারা নিজেরাই সন্ত্রাসীকুল শিরোমণি বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত তাহাদিগকে সন্ত্রাস দমনে নিয়োজিত করার অর্থ হইতেছে একটি সন্ত্রাসকে দমনের জন্য সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে নারকীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা, পার্বত্য-বাসীদের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার মূলে কুঠারাঘাত করা। আমরা জানি সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন করা যায় না, গণবিরোধী শক্তির দ্বারা জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়, একটি অন্যায়কে আর একটি অন্যায়ের দ্বারা, একটি বেআইনী কাজকে আর একটি অধিকতর বেআইনী কাজের দ্বারা প্রতিকার করা যায় না। ইহা কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা নহে ইহা কাঁটা দিয়া রোগী বধ করা বিশেষ।

৪। গণতান্ত্রিক দেশে জনমত বা জনগণের ইচ্ছাই হইল যে কোন কাজের নিয়ামক শক্তি। উক্ত পি, সি, পি-পিজিপি'র সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটির প্রতি জনসাধারণের কোন সমর্থন বা আস্থা আছে কি? আমরা জোর গলায় বলিতে পারি, আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি উক্ত দলের সদস্যদের প্রতি শতকরা ৯৯জন লোকেরই কোন সমর্থন নাই। বরং জনসাধারণ আজ ইহাদের ভয়ে কম্পমান। কারণ ইহাদের অনেকেই নিজ নিজ এলাকার ত্রাস বলিয়া চিহ্নিত। অবৈধ ক্ষমতা ও অস্ত্র পাইয়া পরাক্রান্ত খুঁটির জোরে ইহারা এখন এক একজন মূর্তিমান দৈত্যদানবে পরিণত হইয়াছে। নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হইলে সবকিছুই প্রমাণিত হইবে।

৫। এই দল সম্বন্ধে ইতোমধ্যে অনেক তথ্য, অনেক রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে। এই দলের কয়েক জন নেতৃস্থানীয় দলত্যাগী সদস্য তাহাদের অনেক গুহ্য-গোপনীয় বিষয়াদি, অনেক নেপথ্য কাহিনী ফাঁস করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণের কৌতুহল অনেকাংশে মিটিয়াছে, সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। এই দলের এই গাড়ি-ঘোড়ার বহর, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পয়সা, অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, অস্ত্র-সস্ত্র, তিনতলা সরকারী ভবনে রাজকীয় জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয়াদি জনসাধারণের নিকট আর অজানা নহে। প্রশ্নবোধক চিহ্নের বদলে এখন শুধু একাধিক আশ্চর্যবোধক চিহ্নই জনসাধারণের সম্মুখে ঝুলিতেছে। আমাদের প্রশ্ন অঢেল সরকারী অর্থ ও সম্পদের এই পর্বত প্রমাণ অপচয়ের কোন জবাবদিহিতা আছে কি? ইহার কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হইতে পারে কি?

৬। উক্ত দল সম্বন্ধে জনসাধারণের অনুমান সত্যে পরিণত হইতে সময় লাগে নাই। স্বাভাবিকভাবেই এই দল এখন স্বমূর্তিতে আবির্ভূত। বিভিন্ন প্রকার প্রতারণা, ধোকাবাজী, বেপরোয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও চাঁদাবাজি হরদম চলিতেছে। বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় লোকজনও ইহাদের থাবা হইতে রেহাই পাইতেছেন না। আতংক ও ব্যাপক

নিরাপত্তাহীনতা সর্বত্রই দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। খাগড়াছড়ি চরম নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।

উদাহরণ হিসাবে নিয়ে শুধুমাত্র কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

ক) উক্ত দল গত ০৫-১১-৯৫ ইং তারিখে বিকাল বেলায় খাগড়াছড়ি বাজারের 'বই বিতান' নামক দোকান হইতে প্রদীপ ত্রিপুরা নামক জনৈক ছাত্রকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করে।

খ) উক্ত দল গত ০৬-১১-৯৫ ইং তারিখে সন্ধ্যার সময় চেংগী স্কোয়ারের পানছড়ি বাস ষ্টেশন হইতে নিম্নবর্ণিত ভদ্র লোককে অপহরণ করার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন।

বিবরণ :—নাম-কল্পরঞ্জন ত্রিপুরা, পিতা-নিত্যেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, গ্রাম-সুরেন্দ্র মাষ্টার পাড়া, জোরমরম, খাগড়াছড়ি।

ঐ একই সময়ে কল্পরঞ্জন ত্রিপুরাকে হারাইয়া তাহারা কল্পরঞ্জনের নিম্ন-বর্ণিত সঙ্গীকে তাহার শিশু পুত্রসহ জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায় এবং জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের পূর্বদিকে নিয়া বেদম মারপিট করে। পরে জনৈক মোটর সাইকেল আরোহী পুলিশ কর্মকর্তা সেখানে আসিয়া পড়িলে তিনি বাঁচিয়া যান। সে পুলিশ কর্মকর্তাই তাহাকে বাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

বিবরণঃ—অখিল কুমার ত্রিপুরা, ইউ, পি সদস্য, ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, গ্রাম-রোয়াজা পাড়া, জোরমরম, খাগড়াছড়ি।

গ) গত ২১-১১-৯৫ইং তারিখে উক্ত দল রাত্রি ১০ ঘটিকার সময়ে নিম্নবর্ণিত সাংবাদিককে অপহরণের জন্য তাহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া তল্লাশি চালায়। তিনি বাড়ীতে ছিলেন না বিধায় বাঁচিয়া যান। কিন্তু তাহার বাবাকে অস্ত্রসস্ত্র দেখাইয়া নানাভাবে হেনস্থা করা হয় এবং বাড়ীর বিভিন্ন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা হয়। পরে সেই সাংবাদিককে তাহাদের কার্যালয়ে অর্থাৎ নির্যাতন কেন্দ্রে (উপজাতীয় ছাত্রাবাসে) পাঠাইয়া দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়া তাহারা চলিয়া যান।

বিবরণ :— নাম-শুভ্রজ্যোতি চাকমা, দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি, পূর্ব নারান খিয়া খাগড়াছড়ি।

ঘ) গত ২৫-১১-৯৫ ইং তারিখে বিকাল প্রায় ৩ ঘটিকার সময় উক্ত দল খাগড়াছড়ি বাজারের 'বই বিতান নামক দোকান হইতে নিম্নবর্ণিত যুবককে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাকে উপজাতীয় ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে নিয়া বেদম মারপিটের পর অস্ত্রের মুখে নিজেদের তৈরী অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে ও ক্যাসেটে বক্তব্য রেকর্ড করে। এই ব্যাপারটি যথাসময়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইলেও কোন ফলোদয় হয় নাই। পরে রাত্রি দেড়টায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বিবরণ :— নাম-অমৃত লাল চাকমা, পিতা-দীন মোহন চাকমা, পশ্চিম নারান খিয়া, খাগড়াছড়ি।

ঙ) গত ২৬-১১-৯৫ ইং তারিখ সকাল ১০ টার সময় নিম্ন বর্ণিত কলেজ ছাত্রকে ডাকঘরের সম্মুখ হইতে উক্ত দলের যুবকেরা তাহাদের আস্তানায় (উপজাতীয় ছাত্রাবাসে) ডাকিয়া নিয়া দীর্ঘক্ষণ আটকাইয়া রাখে এবং জোর পূর্বক বিভিন্ন বিষয়ের স্বীকৃতি আদায় করতঃ ক্যাসেটে রেকর্ড করে।

বিবরণ :— নাম-ছোটমণি চাকমা, পিতা-কমলেন্দু চাকমা, উত্তর খবংপড়িয়া, খাগড়াছড়ি।

চ) উক্ত দল গত ১৪-১২-৯৫ ইং তারিখ নিম্নবর্ণিত যুবককে অপহরণের পর উপজাতীয় ছাত্রাবাসে নিয়া অমানুষিক নির্যাতন চালায়। গভীর রাত্রে গুরুতর আহত অবস্থায় তাহাকে মিথ্যা মামলা সাজাইয়া খাগড়াছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়। গুরুতর আহত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাওয়ার কারণে থানা কর্তৃপক্ষ তাহাকে চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করায়। এখনও তাহার চিকিৎসা চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিবরণ :— নাম-দীপংকর চাকমা, পিতা-কালিমোহন চাকমা, পশ্চিম নারান খিয়া, খাগড়াছড়ি।

ছ) গত ০৭-১২-৯৫ ইং তারিখ সকাল ১১ ঘটিকার সময় উক্ত দলের সদস্যরা নিম্নবর্ণিত ভদ্রমহিলাকে খাগড়াছড়ি বাজারের ফেয়ারে লুক নামক দোকানে হয়রানি করে এবং তাহার কিছু কাগজপত্র কাড়িয়া লইয়া যায়।

বিবরণ ঃ— নাম-নিরঞ্জনা চাক্‌মা, পিতা- মনোরঞ্জন চাকমা, গ্রাম-পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি।

জ) গত ২৪-১১-৯৫ ইং তারিখে উক্ত দলের সভাপতি অলক চাকমা মোটা অংকের চাঁদা দাবী করিয়া খাগড়াছড়ির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট নিজস্ব লেটার প্যাডে লিখিত চিঠি প্রেরণ করে। চাঁদা না দিলে জানে শেষ করার স্পষ্ট হুমকি দেওয়া হয়। চিঠির ফটোকপিসহ বিষয়টি যথাসময়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়কে অবহিত করা হইয়াছে।

ঝ) গত ১২-১১-৯৫ তারিখে খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাধা সত্ত্বেও উক্ত দলের সদস্যরা জোর পূর্বক বিদ্যালয়ের উপজাতীয় ছাত্রাবাস দখল করিয়া নেয়। পুলিশের সাহায্য লইয়াও প্রধান শিক্ষক সাহেব এই জবর দখল ঠেকাইতে পারেন নাই। মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে একাধিকবার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের শরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তিনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। এদিকে উক্ত যুবকরা ছাত্রাবাসের বিভিন্ন মূল্যবান সরঞ্জাম নষ্ট করিয়া ফেলা ছাড়াও বিদ্যালয় এলাকার পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশ এমনভাবে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে যে, শুধু পড়াশুনা নহে, শিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষেও বিদ্যালয় এলাকায় স্বস্তিতে বসবাস করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন শিক্ষক পলাইতেও বাধ্য হইয়াছেন। কিছু সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল বহিরাগত যুবক কর্তৃক একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস জবর দখল করার ঘটনা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। সত্য ঘটনা অনেক সময় কল্প কাহিনীকেও হার মানায়, ইহা তাহার একটি জাজ্বল্য প্রমাণ।

ঞ) উক্ত দল কর্তৃক পথে ঘাটে, এখানে ওখানে বিভিন্ন যুবককে ধরিয়া, আটকাইয়া, হুমকি ধমকি দেওয়া, অপদস্থ করা, মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা প্রভৃতি আজকাল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে এখন অনেক লোক বাজারে বা অফিস আদালতে যাইতেও ভয় পাইতেছে।

৭। দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘনাইয়া আসিতেছে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন আমাদের সকলের কাম্য। কিন্তু যেখানে অবৈধ অস্ত্রধারী মস্তান দলের নর্তন-কুর্দন থাকিবে, যেখানে অদৃশ্য শক্তির রক্তচক্ষু সক্রিয় থাকিবে সেখানে নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকিতে পারে না। আমরা দেখিতেছি খাগড়াছড়িতে নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া হতাশাব্যঞ্জক পর্যায়ে আসিয়া যাইতেছে। উপরোক্ত দলের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও অপ্রতিরোধ্য স্বেচ্ছাচারিতা অব্যাহত থাকিলে ভোটের ফলাফল যে তাহাদের অঙ্গুলি হেলনেই নির্ধারিত হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৮। ক) আমরা দেখিতেছি বিরাট এক বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য সবে মাত্র শুরু হইয়াছে। এই নাটকের পরবর্তী লোমহর্ষক ও ভয়াবহ দৃশ্যগুলি আমরা আর দেখিতে চাহিনা। এই অনভিপ্রেত নাটকের এখানেই যবনিকাপাত ঘটুক তাহাই আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই।

খ) একই সঙ্গে আমরা ইহাও চাই— অঢেল সরকারী অর্থ ও সম্পদের বিনিময়ে সমগ্র উপজাতীয় যুবসমাজকে রসাতলে প্রেরণের ষড়যন্ত্রমূলক এই নোংরা খেলার সমাপ্তি হইসেল অবিলম্বে বাজানো হউক এবং উক্ত দলের সদস্যদেরকে জরুরী ভিত্তিতে জাতি গঠনমূলক কাজে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হউক।

গ) আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রশাসনের নাকের ডগায় দৈত্য দানবের মাতামাতি দেখিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা চাই খাগড়াছড়ি জেলায় পরিপূর্ণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং

বিনীত,

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	হংসধ্বজ চাকমা	আহ্বায়ক, যোগাযোগ কমিটি	
২।	অনন্ত বিহারী খীসা	সদস্য, যোগাযোগ কমিটি	
৩।	দোস্ত মোহম্মদ চৌধুরী	সাবেক সদস্য, স্থানীয় সরকার, জেলা পরিষদ	
৪।	সুখাংশু শেখর চাকমা	ব্যবসায়ী	
৫।	মমাংশ মারমা	মুক্তিযোদ্ধা	

সংবাদ

সেনা ক্যাম্প স্থাপন

চলতি যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনারা আরো নূতন ক্যাম্প স্থাপন করে যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে। জানা গেছে যে, গত ১২ই জানুয়ারীতে নানিয়াচর জোন, ঘাগড়া জোন ও রাঙ্গামাটি সদর জোনের সম্মিলিত উদ্যোগে সেনাবাহিনী নানিয়াচর থানার ৭৯নং কেঙেলছড়ি ও বেতছড়ি মৌজা সীমানাস্থ লাঙেলধারা নামক স্থানে এক নূতন সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্যাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেনা অভিযানের সময় স্থায়ী যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য এই সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২১-১০-৯৫ইং তারিখে বান্দরবন জেলার রোয়াংছড়ি থানাধীন তারাং নদীর মুখে ফরেষ্ট অফিসের পাশে ১টি, নভেম্বর, ৯৫ইং এর প্রথম সপ্তাহে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানাধীন মানিকছড়ি ও হাতিমুড়ার মধ্যবর্তী কিষ্টছড়ায় ১টি ও ডিসেম্বর, ৯৫ইং এ রাজস্থলী থানার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের মুবাছড়ি ও হলছা পাড়ায় ২টি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধবিরতিকালে (আগষ্ট। ৯২—জানুয়ারী ৯৬ইং) বাংলাদেশ সেনারা ৪০টি নূতন ক্যাম্প স্থাপন করেছে।

জুম্ম ছাত্রী ধর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা

অতি সম্প্রতি ২জন জুম্ম স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের এক পাশবিক হামলা থেকে আত্মসম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,গত ১৭ই জানুয়ারীতে স্কুল থেকে ফেরার পথে পুজগাং হাইস্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী রুপিকা চাকমা (১৬) পীং আলীচান চাকমা, কালানাল, পানছড়ি ও একই হাইস্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী শুক্রমিতা চাকমা (১৪) পীং মহিনীময় চাকমা (ঠিকানা-ঐ) -কে কালানাল সেনা ক্যাম্পের সেন্ট্রি পোষ্টের নিকটবর্তী স্থানে মোশারফ ও রফিক নামে ২ জন ভিডিপি সদস্য দিনদুপুরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই ধর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জুম্ম ছাত্রীদ্বয় প্রবলভাবে বাধা দেয় ও চিৎকার করতে থাকে। তাদের চিৎকার শুনে আশেপাশের জুম্মরা এসে তাদেরকে ভিডিপিদের হাত থেকে উদ্ধার করে। উল্লেখ্য যে, ভিডিপিরা জুম্ম ছাত্রীদের ধর্ষণে সক্ষম না হলেও তাদের পরিহিত ফ্রক পায়জামা ছিড়ে দেয়। আরো জানা যায় যে, কালানাল সেনা ক্যাম্প কম্যাণ্ডার এই ঘটনার ধামাচাপা দেওয়ার প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিল ও আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের মুখে পুলিশ ধর্ষণের মামলা গ্রহণ ও ধর্ষণকারী ভিডিপিদেরকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার চলতি যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকা সত্বেও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে শান্তিবাহিনী কয়েকবার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ১২ই জানুয়ারীতে নানিয়াচর জোন হতে দুই শতাধিক সেনা নানিয়াচর থানার কেঙেলছড়ি ও বেতছড়ি মৌজার প্রত্যন্ত এলাকায় ক্যাম্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। ১৪ই জানুয়ারী এই সেনারা এক পর্যায়ে শান্তি বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এক প্রতিরক্ষাত্মক হামলা চালাতে বাধ্য হয়। এরপর ১৬,১৭ ও ২৭ জানুয়ারীতেও শান্তিবাহিনীর সদস্যরা একই কারণে সেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। এসব আক্রমণে ২৫জন সেনা হতাহত হয়েছে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। কিন্তু সেনারা যুদ্ধবিরতির লংঘনের জন্য দায়ী বলে বাংলাদেশ সরকার ঐসব সংঘর্ষে প্রকৃত ঘটনা গোপন রেখে বিপরীতে শান্তিবাহিনীকে এসব সংঘর্ষের জন্য দায়ী করেছে।

মুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাস অব্যাহত

সম্প্রতি পিসিপি-পিজিপি সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি নামীয় মুখোশধারী এক সন্ত্রাসী বাহিনীর তাণ্ডবতায় খাগড়াছড়ি, পানছড়ি ও দিঘীনালায় জুম্ম জনজীবনে এক অশান্তি নেমে এসেছে। খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ মদতে এই মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে মারাত্মক হাতিয়ার নিয়ে ঘোরাফেরা, নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানি ও মারধর এবং রাতের অন্ধকারে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদের কর্মী ও সমর্থককে অপহরণ ও নির্যাতন করে চলেছে। আরো মজার ব্যাপার হল এই মুখোশধারীরা পিপিএস পি সি নামে বিভিন্ন সময়ে জুম্ম স্বার্থবিরোধী দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিল ও সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। গত ১৩ই জানুয়ারীতে সন্ত্রাসীরা ঢাকায় এরূপ এক মিছিল ও সমাবেশ করেছে। উল্লেখ্য যে, এই পিপি এস পিসি'র এসব মিছিলের শ্লোগান হচ্ছে পাহাড়ী ছাত্র-গণ পরিষদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করা ও বিপরীত দাবী উত্থাপন করা। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল এই সন্ত্রাসীরা বর্তমানে খাগড়াছড়ি সরকারী স্কুলের ছাত্রাবাসটি দখল করে মদের আড্ডা বসিয়েছে। আর এই মদের পয়সা যোগাচ্ছে খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের বিশেষ তহবিল।

উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক মাস যাবৎ মুখোশধারী এই সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশ আর্মি ও পুলিশের সহায়তায় দিবালোকে ও রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণকে অপহরণ ও নির্যাতন করেছে। এতদসঙ্গে সন্ত্রাসীদের অপহরণ ও নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল—গত ৫ই নভেম্বর, ৯৫ইং তারিখে সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি বাজারস্থ বই বিতান নামক দোকান হতে প্রদীপ ত্রিপুরাকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণ ও নির্যাতন করেছে। ২৫শে নভেম্বর, ৯৫ইং তারিখে সন্ত্রাসীরা একই দোকান হতে অমৃত লাল চাকমাকে অপহরণ ও নির্যাতন করে। পরদিন ২৬শে নভেম্বর, ৯৫ সন্ত্রাসীরা আবার খাগড়াছড়ি ডাকঘরের সম্মুখ হতে ছোটমনি চাকমাকে তাদের আস্তানায় (উপজাতীয় ছাত্রাবাসে) দীর্ঘক্ষণ আটক করে রাখে ও জোরপূর্বক বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করে। একইভাবে সন্ত্রাসীরা ৪ঠা ডিসেম্বর, ৯৫ইং তারিখে দীপংকর চাকমা, ১২ই ডিসেম্বর, ৯৫-কল্যাণ চাকমা, ১৩ই ডিসেম্বর, ৯৫ ও ১৫ই ডিসেম্বর, ৯৫ রিপন চাকমাকে রাতের অন্ধকারে অপহরণ ও নির্যাতন করে এবং ৯ই জানুয়ারী, ৯৬ তারিখে জিনুরায় ত্রিপুরা পীং মনোরঞ্জন ত্রিপুরা, পোবাংছড়া, দিঘীনালা কে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সামনে আক্রমণ ও মারধর করে।

"পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাক্‌মা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, ম্রুং ও চাক এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা জুম্ম বলি।"

—এম, এন, লারমা

জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

শুভেচ্ছা মূল্য—৪ টাকা